নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ১৭ পৃ: ০৭-২৫
© ২০১২ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

রবীন্দ্রনাথ সরেন, আহমেদ বোরহান ও মাহমুদুল সুমন*

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের প্রান্তিক জাতিসত্তা: ভূমিকেন্দ্রিক সমীক্ষা ও বয়ান

tes.ti.mony [টেস্‌টিমনি vs মৌনি) n [v] ১ প্রামাণিক সাক্ষ্য; (আদালতে) কোনো কিছুর সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান। ২. বিবৃতি : According to the ~ of the physicians
[Bangla Academy English-Bengali Dictionary (First Edition)]

tes.ti.mony (..)
1. a declaration or statement made under oath or affirmation by a witness in a court, often in response to questioning, to establish a fact.
2. any affirmation or declaration.
3. any form of evidence, indication, etc. ; proof [the smile that was testimony of disbelief]
4. public avowal, as of faith or of a religious experience.
5. Bible a) the tablet bearing the mosaic law; Decalogue; Ex.25: 16 b) [Pl.] the precepts of God. SYN. PROOF

[Webster's New World Dictionary Third College Edition]

১

নৃবিজ্ঞানী হেবডিজ ১৯৯৩ সালের এক আলোচনায় বলেছেন, 'আমাদের এখন প্রয়োজন একটা নতুন ধারার রাজনৈতিক কল্পনা'। তিনি আরও বলেন, 'আমাদের বিষয় সম্পর্কে ভিন্ন আরও খোলামেলা সমালোচনা দরকার' আর এ কারণেই (নৃবিজ্ঞানের জ্ঞান শাস্ত্রীয় জায়গা থেকে) কেবল মাত্র এথনোগ্রাফিক বর্ণনার থেকে বেশি জোর দেওয়া দরকার সাক্ষ্য-প্রমাণের দিকে। হেবডিজ মনে করেন, কোনো কিছুর সাক্ষী হওয়ার মানে হচ্ছে ক. একটি নির্দিষ্ট অবস্থান গ্রহণ করা এবং খ. সাক্ষ্য বা বিবৃতি প্রদানের এক ধরনের দায়িত্ববোধ, হেবডিজের ভাষায় 'a form of a caring vigilance' (হেবডিজ উদ্ধৃত হয়েছেন লিসা এইচ *মালকি* ১৯৯৭: ৯৪)।

---

* রবীন্দ্রনাথ সরেন, সভাপতি, জাতীয় আদিবাসী পরিষদ,বাংলাদেশ। আহমেদ বোরহান, গবেষক, ইনসিডিন বাংলাদেশ। মাহমুদুল সুমন, সহকারী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার ঢাকা, বাংলাদেশ।

সমাজ গবেষণায় নানা ধরনের তাত্ত্বিক ও পদ্ধতিগত তৎপরতার এ সময়ে এ আলোচনা ভাবিয়ে তোলার মতো। বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিসা মালকি (১৯৯৭) একটা তুলনা টানছেন: ক্লাসিক্যাল নৃবিজ্ঞানীর আছে 'মাঠভিত্তিক উপাত্ত' আর সাক্ষীর থাকে 'সাক্ষ্য বা সাক্ষ্য প্রদানের দায়বদ্ধতা'। এখানে মনে রাখার বিষয় হচ্ছে সাক্ষী হিসেবে সাক্ষ্য দেওয়া অন্যের পক্ষে কিছু বলা নয়; বরং সাক্ষ্য নিজেরই একটি বিষয়, একটি দায়িত্ব। মালকির মতে, হেবডিজের এ ধারণায় 'মানুষ', 'সম্প্রদায়', 'জীবনব্যবস্থা' বা 'সমাজকে' একটা ব্যবস্থা হিসেবে দেখার পুরানা অভ্যাসকে বাতিল করে দিতে পারে এবং আমাদের মনোযোগী করে তুলতে পারে সে চিহ্নগুলোর দিকে যাকে গ্রামসি বলেছিলেন 'trace'। গ্রামসির সেই বিখ্যাত উক্তিটি আবারও এখানে উদ্ধৃত করছি:

> "'knowing theyself' [is] a product of the historical process to date which has deposited in you an infinity of traces, without leaving an inventory."
> (গ্রামসি, উদ্ধৃত হয়েছেন মালকি ১৯৯৭: ৯৫)

সাক্ষ্য বা সাক্ষ্য-প্রমাণের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় মানবাধিকার-বিষয়ক গবেষণা কাজে, রাজনৈতিক তৎপরতা থেকে শুরু করে এমনকি ধর্মীয় কাজেও। ল্যাটিন আমেরিকায় সাক্ষ্যকে একটা বর্ণনামূলক কর্ম এবং রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবেই ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। মাক্লিনটকের সংজ্ঞামতে, সাক্ষ্য (testimonial) হচ্ছে সাংবাদিক বা নৃবিজ্ঞানীর কাছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বলা জীবনকথা এবং এর একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে: একটা স্পষ্ট বহুত্ববাচক 'কর্তার' উপস্থিতি। আত্মজীবনীতে এমনটি দেখা যায় না বলেই মাক্লিনটকের অভিমত। আবার সাক্ষীর ধারণাটি বা সাক্ষ্য দেওয়ার বিষয়টির সঙ্গে আইন-অদালতের সম্পর্ক আছে। মালকি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, পুলিশের কাজের ধরন আর নৃবিজ্ঞানীর কাজের ধরনে কিছু মিল আছে, যদিও তাঁদের কাজের উদ্দেশ্য সাধারণত আলাদা! এ মিল ও অমিলের পরিপ্রেক্ষিতে মালকি নৃবিজ্ঞানের কাজের ধরনকে দুটি মডেলের আঙ্গিকে ভাবার কথা বলেন। ক. নৃবিজ্ঞানী যেখানে ইনভেস্টিগেটর এবং খ. নৃবিজ্ঞানী যেখানে সাক্ষী। তিনি আরো বলছেন: এ দুটি একটি অপরটির বিকল্প–এমন নয়। মালকি বর্ণিত এ দুই মডেলের প্রসঙ্গ এখানে নিয়ে আসার কারণ মূলত কোন্ দৃষ্টিভঙ্গিতে এ লেখাটিকে বিবেচনা করা যাবে, সে সম্পর্কে একটি ইঙ্গিত দেওয়া। লেখাটিতে ক্লাসিক্যাল নৃবিজ্ঞানের 'মাঠ ভিত্তিক উপাত্তর' ধারণা থেকে সরে গিয়ে আমরা সাক্ষ্য বা বিবৃতি প্রদানের দায়বদ্ধতার ধারণাকে ব্যবহার করতে সচেষ্ট হয়েছি। এভাবে আমরা, সংগঠক, ও গবেষকরা আমাদের দায়বদ্ধতার এমন এক পরিসরকে উন্মোচন করতে চেষ্টা করেছি, যার সঙ্গে তুলনা করা চলে কেবল এক্টিভিস্ট নৃবিজ্ঞানের।

এই লেখাটিতে আমরা মূলত বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভূমিসমস্যা বিষয়ে একটি অঞ্চলভিত্তিক চিত্র পেতে চেষ্টা করেছি এবং জোর দিয়েছি ভুক্তভোগীদের[২] দেওয়া সাক্ষ্য সংরক্ষণ করতে। লেখাটি একটি যৌথ কাজের ফল যেখানে আমরা লেখকরা ছাড়াও অংশ নিয়েছেন জাতীয় আদিবাসী পরিষদ নামের একটি সংগঠনের নানা পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা। সংগঠনটি ২০০৮ সালে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় কাজের সূত্র ধরে জনপদগুলোতে আদিবাসী জন সমাজে ভূমি-হারানোর প্রক্রিয়ার ওপর একটি জরিপ ও

মতবিনিময় সভা সম্পন্ন করে। জাতীয় আদিবাসী পরিষদের উদ্যোগে এবং উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু জেলা ও থানাপর্যায়ের আদিবাসী পরিষদের নেতা-কর্মীদের সহায়তায় এ জরিপকাজ পরিচালনা করা হয়। এ ছাড়া দিনাজপুর জেলা সমাজ উন্নয়ন সমিতি ও বাংলাদেশ আদিবাসী সমিতির কর্মীরাও এ ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। এটি করতে একটি বিশেষ জরিপ-ফর্ম ব্যবহার করা হয়, যার ভিত্তিতে এলাকাভিত্তিক তথ্য-সংগ্রহ করার কাজটি সম্পন্ন হয়। এই জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে একটি তথ্যসারণি তৈরি করা হয়। এ কাজে বিশেষায়িত সফটওয়ারের সাহায্য নেওয়া হয়। বর্তমান উপস্থাপনায় এ সফটওয়ার চালিত তথ্যসারণির ভিত্তিতে কিছু সামগ্রিক উপাত্ত হাজির করা হয়েছে।

পরবর্তীতে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের পাঁচটি জেলা শহর রাজশাহী, নওগাঁ, জয়পুরহাট, দিনাজপুর ও রংপুরে মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। মতবিনিময় সভাগুলোতে উপস্থিত থেকে ভুক্তভোগী মানুষের বয়ান আমরা রেকর্ড করেছি। এ ক্ষেত্রে আমাদের একটি কেন্দ্রীয় উপলব্ধি হচ্ছে: ভূমি বিষয়ে নানা ধরনের তৎপরতা চোখে পড়লেও অনেক ক্ষেত্রেই সরাসরি ভুক্তভোগীর কথা নিছক ডকুমেন্টেশন সংক্রান্ত খামখেয়ালির কারণে হারিয়ে যায়। আমরা ভুক্তভোগীদের এ বয়ানকে বর্তমান প্রচেষ্টায় তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। প্রকাশনাটিতে ব্যবহৃত ট্রান্সক্রিপশন-এর সম্পাদনা, বাছাই ইত্যাদি ক্ষেত্রে সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে সভাগুলোতে উপস্থিত আদিবাসীদের দেওয়া বক্তব্য-বয়ানকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এ সম্পাদনা, বাছাইয়ের ক্ষেত্রে মৌখিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার কঠোর নিয়ম রক্ষা করা সম্ভব হয়নি লোকবল ও টেকনিক্যাল দক্ষতার অভাবে। অনেক ক্ষেত্রে রেকর্ডকৃত বয়ান সম্পূর্ণ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি; তথাপি সেই বয়ান আমরা সবক্ষেত্রে বাদ দিইনি। বরং কিছু পদ্ধতি অনুসরণ করে (যেমন ... অথবা [..] ব্যবহার করে আমরা অস্পষ্ট জায়গাগুলো চিহ্নিত করেছি) আমরা বয়ানগুলো রেখে দিয়েছি এবং এর কথ্য ভাবকে বজায় রাখতে সচেষ্ট থেকেছি। ভুক্তভোগীর বয়ান অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে প্রান্তিক কৃষিজীবী জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বশীল অংশের বক্তব্য আলোচনা, মতামত, ও অভিজ্ঞতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বয়ানের নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই প্রবন্ধের লেখকেরাই শেষ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের এই বয়ান সামাজিক ইতিহাসের এমন এক অধ্যায়কে উন্মোচন করবে বলে আমাদের মনে হয় যা বাঙালি/ মুসলমান জাতি-রাষ্ট্রের জাত্যাভিমানের কারণে প্রায়ই চিহ্নিত হতে পারে না, বা চিহ্নিত হয় না।

২

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, জয়পুরহাট, নওগাঁ জেলার পাহাড়ি, মুণ্ডা, সাঁওতাল, ওরাঁও, পাহান সম্প্রদায় প্রধানত কৃষি ও ভূমির ওপর নির্ভরশীল এক জনসমষ্টি। এই সম্প্রদায়ের ভূমি হারানোর নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া, এবং প্রতিকার বিষয়ে নানা পর্যায়ে আলোচনা শুরু হয়েছে তাও প্রায় এক দশক হতে চলল। এ আলোচনায় নানাবিধ প্রেরণার জায়গা থেকে শামিল হয়েছে আদিবাসী রাজনৈতিক সংগঠন, এনজিও, গবেষক, সাংবাদিক,

ছাত্রসমাজসহ আরও অনেকে। এ আলোচনার শুরুতে তথ্যের ঘাটতি ছিল, ছিল পরিচয়ের অভাব। শিক্ষিত 'আধুনিক' মনস্ক মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীর দিক থেকে প্রান্তিক এই সম্প্রদায়কে, সংস্কৃতিকে বা তার জীবনব্যবস্থাকে চিনতে পারা না-পারার বিষয়টি বা এটির সঙ্গে যুক্ত রোমান্টিকতাতে উপনিবেশিক ডিসকোর্স তথা টেক্সটের আলোকে দেখা জরুরি।[২]

ভূমি বিষয়ে শুরুর দিককার উদ্যোগ ও ডিসকোর্স খানিকটা আদর্শিক ধরনের মনে হয়েছিল, খানিকটা সারা দুনিয়ায় 'আদিবাসী' জনগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ে যেভাবে ভাবা হচ্ছিল, তারই এক হুবহু, অনুরণন পাওয়া যাচ্ছিল বাংলাদেশে, বিশেষ করে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বসবাসরত প্রান্তিক আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এমনটাই মনে হচ্ছিল।[৩]

২০০০-২০০১ সাল। কিছু উদ্যোগের শুরু তখন থেকেই। আদিবাসীদের ভূমি সমস্যাবিষয়ক এক কর্মশালা চলাকালীন এ লেখার একজন সংগঠকের সঙ্গে কথা হয়েছিল সরাসরি কয়েকজন আদিবাসী ভুক্তভোগীর সঙ্গে, যারা ভূমিগ্রাসীদের হাতে জমি হারিয়েছেন অথবা নানা ধরনের মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে গেছেন। আলোচনার মূল-স্বরটা এ উপস্থিত জনগোষ্ঠীর অনেকেই সেদিন ধরতে পারছিলেন না। সেদিনের আলোচনায় এ অঞ্চলের আদিবাসীদের 'ঐতিহ্যবাহী ভূমি-ব্যবস্থার' কথা উঠেছিল। কিন্তু জমিজমা নিয়ে নানাভাবে নিপীড়িত কিছু মানুষের হাতে সেদিন ছিল জমির দলিলসহ নানা কাগজপত্র। হয়তো আশা করে এসেছিলেন ভূমিবিষয়ক এ কর্মশালা থেকে কোনো সুরক্ষা বা উপকার পাবেন। তেমন কিছুই হয়নি।

দীর্ঘদিন ধরে এ জনগোষ্ঠীর ভূমিসমস্যার নানা দিক নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করে আসছে নানা সংগঠন এবং এ অঞ্চলের বিশেষত বিভিন্ন আদিবাসীগোষ্ঠী কীভাবে ও কী পরিমাণ জমি হারিয়েছে তা গবেষণা, নানা পর্যায়ের জরিপকাজ থেকে দেখানোর চেষ্টা করে আসছে। এই প্রচেষ্টাগুলোয় নানা ধরনের পদ্ধতির সমন্বয় ও পদ্ধতিতত্ত্বের সাহায্যে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের আদিবাসীগোষ্ঠীর ভূমি হারানোর প্রক্রিয়ার একটি চিত্র ফুটে উঠেছে। সার্বিক না হলেও একটি সংখ্যাতাত্ত্বিক মোজাইক আমরা এ গবেষণা থেকে পেয়ে যাই। যেমন: টৌন ব্লির দীর্ঘমেয়াদি গবেষণায় কিছু প্রবণতা সূত্রায়িত হতে দেখি, যার একটি সারসংক্ষেপ এখানে উল্লেখ করছি। ব্লির গবেষণা থেকে স্পষ্ট হয়, অন্যান্য আদিবাসী ও বাঙালিদের মতো সাঁওতালদের বিভিন্ন মাত্রায় জমিদার ও জোতদারদের অধীন জমির স্বত্ব ছিল সেই ১৯৪৭ সাল থেকেই; পঞ্চাশের দশকের শুরুতে সংগঠিত ভূমি আইনে পরিবর্তনের আগে-পরে অনেক জমি বৈধ ও অবৈধ উপায়ে হস্তান্তর হয়েছে; এবং এর পেছনে কারণ হিসেবে কাজ করেছে ১৯৪৭-এর দেশ ভাগ এবং সেই সময়ের 'সাম্প্রদায়িক'[৪] টেনশন। দেশভাগ উত্তর-পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু জমির মালিকদের একটা বড় অংশ নিরাপত্তাহীনতার বোধ থেকে জমি বিক্রি করে চলে যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে জমিজমা, ভিটাবাড়ি অনুগত পোষ্য আদিবাসী ও বাঙালি বর্গাচাষির কাছে রেখে যায়। টৌন ব্লির গবেষণায় আশির দশকে সংগৃহীত কয়েকজন বয়স্ক আদিবাসীর দেওয়া বিবৃতি থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে অনেক আদিবাসী মানুষ ১৯৫০/৫১ সালে মালিকানা স্বত্বের সুয়োগ নিতে পারেনি। সব তথ্য-প্রমাণ এমনটাই ইঙ্গিত করে যে ১৯৪৭ সালে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অধিকাংশ

আদিবাসীই কৃষিকাজে নিয়োজিত এবং বর্গাচাষি ছিল। কার্যত ভূমিহীন আদিবাসীর শতাংশ ছিল ২৫ ভাগ। ১৯৭২-পরবর্তী ভূমিবিষয়ক যে ব্যবস্থাদি তৈরি হয়, তা ভূমি হারানোর প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এ সময় বন্ধকির মধ্য দিয়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে আদিবাসীরা জমি হারিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই বন্ধকি জমি বৈধ বা অবৈধ বিক্রিতে পর্যবসিত হয়। স্থানীয় 'প্রভাবশালীরা' অনেক ক্ষেত্রেই জাল, ভয়ভীতি এবং তহশিল অফিস ও ভূমিবিষয়ক অন্যান্য অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে জমি দখল করতে সক্ষম হয়। এ গবেষণা থেকে আমরা উত্তর বাংলার আদিবাসী জনসমষ্টির ভূমি সমস্যার প্রকৃতি সম্পর্কে খোঁজ পেতে শুরু করেছি।

হীরেন দাস (২০০৭) কর্তৃক পরিচালিত এক গবেষণায় নির্দিষ্টভাবে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর ওপর কিছু পরিসংখ্যান উঠে এসেছে, এটি সার্বিক কোনো চিত্র নয়। তবে এটি সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বর্তমান অবস্থার একটি আংশিক চিত্র আমাদের দেবে। পি. এ. আর. (Participatory Action Research) পদ্ধতিতে করা এ গবেষণায় কিছু সীমাবদ্ধতা থাকলেও বেশ কিছু বিষয় এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সেগুলোর চুম্বক অংশ এখানে তুলে ধরছি। দিনাজপুর সদর উপজেলার দুটি ইউনিয়নে পরিচালিত (যথাক্রমে ১ নম্বর চেহেলগাজী ও ৪ নম্বর শেখপুরা) হয়েছে এ গবেষণা। সাঁওতাল জনগোষ্ঠীকে 'আদি সাঁওতাল', 'ধর্মান্তরিত' ও 'স্থানান্তরিত' এ ভাগে বিভক্ত বলে গবেষকেরা দেখতে পেয়েছেন এবং দাবি করেছেন যে চেহেলগাজী ইউনিয়নে আদি সাঁওতাল পরিবারের সংখ্যা বেশি এবং শেখপুরা ইউনিয়নে ধর্মান্ত রিত (খ্রিষ্টান) ও স্থানান্তরিত হয়ে এসে বসবাসরত সাঁওতালের সংখ্যাই বেশি। গবেষণার প্রয়োজনে পরিচালিত জরিপ দেখাচ্ছে চেহেলগাজী ইউনিয়নে ছয়টি গ্রামে ১৪টি পাড়ায় ২১৪টি পরিবারের ৯৮৬ জন মানুষ বসবাস করে। এদের মধ্যে একেবারেই জমি নেই ৯৪টি পরিবারের এবং এক থেকে পাঁচ শতক জমি আছে ৫৭টি পরিবারের। এ ছাড়া ৫ থেকে ৩৩ শতাংশ জমি আছে এমন পরিবারের সংখ্যা ৪৩টি ও ৩৩ শতাংশের বেশি জমি আছে মাত্র ২০টি পরিবারের। চেহেলগাজী ইউনিয়নের জরিপকৃত পাড়ায় 'আদি সাঁওতাল' ১২৭টি ও 'খ্রিস্টান সাঁওতাল' পরিবার রয়েছে ৮৭টি। অন্যদিকে শেখপুরা ইউনিয়নে আটটি গ্রামে ১৬টি পাড়ায় ১৬৯টি পরিবারের মোট ৭৪৩ জন মানুষ বসবাস করে। এদের মধ্যে জমি নেই ১৪৫টি পরিবারের; এক থেকে পাঁচ শতাংশ সাতটি পরিবারের, ৫ থেকে ৩৩ শতাংশ জমি আছে ১৫টি পরিবারের ও ৩৩ শতাংশের বেশি জমি আছে মাত্র একটি পরিবারের। এখানে আদি সাঁওতাল আছে ৪০টি ও খ্রিস্টান সাঁওতাল পরিবার ১২৭টি; দুই জরিপকৃত এলাকায় মাঞ্জহিহাড়ামের (গোত্রপ্রধান) সংখ্যা যথাক্রমে ২২ ও ১২, যা অনেক বেশি বলে মনে করছেন গবেষকেরা(?)। গড়ে প্রতি ১১টি পরিবারের জন্য একজন করে মাঞ্জহিহারাম। এখানে গবেষকেরা বলছেন, সাঁওতাল জনগোষ্ঠী বহু নেতৃত্বে ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে (পৃ. ৮)। লেখকদের মতে, খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে মাঞ্জহিহাড়াম আছেন; উপরন্তু চার্চগুলীর নিয়ন্ত্রণ আছে ও বিভিন্ন চার্চ অনুসারীরা বিভিন্নভাবে বিভক্ত। এতে সাঁওতালদের মধ্যে ব্যাপক বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে ও তাদের মধ্যে একতা বিঘ্নিত হচ্ছে। গবেষণার অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে সম্প্রদায়গত কোন্দল, বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস (বিভিন্ন মালিকের জায়গায় বাড়ি করে থাকায়) ইত্যাদি কারণে গবেষণা সব

ক্ষেত্রে সফলভাবে সম্পন্ন করা যায়নি। যেমন গবেষকেরা বলছেন, দুটি পাড়া মিশন নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় এ দুটি পাড়ার সব পরিবারকে গবেষণায় উৎসাহী করা যায়নি। এ পাড়ার অধিকাংশ পরিবার ক্যাথলিক চার্চের জমিতে আশ্রিত, স্থানান্তরিত ও চার্চ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত (পৃ. ১১)। উল্লেখ্য, পার-এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গবেষক ও গবেষিতদের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য না করে অংশগ্রহণমূলকভাবে গবেষণাকর্ম সম্পাদন করা। এ গবেষণায় অংশগ্রহণকারীরা যেভাবে ক্ষোভ, দুঃখ, বেদনা ইত্যদি তুলে ধরেছেন, তার কয়েকটি তুলে ধরা হলো:

–'আমরাই কৃষিকাজের জমি তৈরি করে কৃষির উৎপত্তি ঘটিয়েছি, আর আমরাই খাওয়া পাই না'

–'যুদ্ধের আগে বিহারিরা, আর যুদ্ধের পর ফিরে এসে দেখি বাঙালিরা আমাদের জমি দখল করে নিছে, আর আমাদের তাড়াইছে–মঙ্গল হাসদা'–হড় ভাষায় 'বার' মানে ২, বাঙালিকে হড় বলল বার বিঘা জমি বিক্রি করব, বাঙালি প্রতারণা করে লিখল 'বারো' অর্থাৎ ১২ বিঘা হড়কে বুঝছিল বার বিঘা হড়, বুঝল দুই বিঘা। তিন দিন পর ১২ বিঘা জমি গেল। এ রকম আরও কত প্রতারণা, যার শেষ নেই'

–'হড় আইজকে যে পেছনে গেছে কেমন করি, সেটা হলো হড়ের কাছে বাঙালি আসিল, বলল, 'আমার থাকার জায়গা নাই, একটু মাথা গুঁডি।' তারপর হড় জায়গা দিল। এই শুরু হলো। বাঙালি আসি ঠেলা মারতে শুরু করল, একটু একটু সরতে সরতে আইজ সামনে থেকে পিছনে'

এ কথাগুলো সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর আত্মগঠনের ঐতিহাসিকতাকে নির্দেশ করে। গবেষণার ২১ পৃষ্ঠায় আবারও উল্লেখ করা হয় যে বেশির ভাগ জায়গায় একাধিক গ্রামপ্রধান থাকায় গ্রামের মানুষরা একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছেন, ঐক্য বিনষ্ট হচ্ছে, কেউ সালিস-বিচার মানছেন না এবং একে অপরকে সহযোগিতা না করে ক্ষতি করার চেষ্টা করছেন, হিংসা-বিদ্বেষ সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অপরদিকে খ্রিস্টান সাঁওতালরা বিভিন্ন চার্চভুক্ত হওয়ায় এক চার্চের অনুসারীরা অন্য চার্চের অনুসারীদের সহ্য করতে পারে না। আরও বলা হচ্ছে, মিশনারিদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়ায় সমাজ কাঠামো বিলীন হয়ে পড়েছে।[৫]

এ গবেষণা থেকে প্রাপ্ত বয়ান বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ। তবে সাঁওতালদের মধ্যে বিদ্যমান 'কুসংস্কার' গুণ, জাদু, প্রেতাত্মা (ডাইনি), বিশ্বাসকে কীভাবে রেপ্রিজেন্ট করা হবে, সে বিষয়ে গুরুত্বের সঙ্গে দেখা দরকার। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য নির্দেশ করে, এ জনগোষ্ঠীর নারী-পুরুষ উভয়েই একত্রে শ্রম বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন; কাজের প্রধান ক্ষেত্র কৃষিকাজ বা দিনমজুর; বাংলা বছরের অগ্রহায়ণ হতে বৈশাখ পর্যন্ত কাজ...যাতে সাঁওতালরা মজুরি-বৈষম্যের শিকার; ৯৮ শতাংশের অন্য কোনো সম্পদ বা আয়ের বিকল্প পথ নেই; বৃহত্তর জনগোষ্ঠী কোনোভাবেই তাদের পাশাপাশি রেখে বসবাস করতে চান না। সাঁওতালরা বাঙালির বাড়ি হতে দূরে বসবাস করেন, হীনম্মন্যতায় ভোগেন। বনিবনা না হলে সাঁওতাল কখনো কখনো হয়ে যায় সাঁওতালের বাচ্চা। রয়েছে নেতৃত্বে সংকট : আদি সাঁওতালরা এগিয়ে এলে খ্রিস্টান সাঁওতালরা তা মানেন না। একই গ্রামে একাধিক গ্রামপ্রধান বানিয়ে বিভক্ত সাঁওতালরা; কিন্তু কার প্রভাবে, তা স্পষ্ট নয়। মিশনের প্রভাব অবশ্য অন্যত্র উন্মোচিত হয়েছে: অলিখিত চুক্তি মিশন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা; না করলে মিশনের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত

করা হয়। গবেষণার চারটি কেইস স্টাডি থেকে গবেষকদের দৃষ্টিভঙ্গির একটি চিত্র পাওয়া যায়। তবে 'যুগ যুগ' বা 'আদিম' শব্দের যত্রতত্র ব্যবহার ঔপনিবেশিক নৃবিজ্ঞান ও জ্ঞানের কথাই মনে করিয়ে দেয়।[৬]

বারাকাত ও অন্যান্যদের (২০০৯)[৭] সাম্প্রতিক ভূমি-সমীক্ষা এ বিষয়ে সাম্প্রতিক প্রকাশনা এবং সম্ভবত প্রথমবারের মতো গবেষণা পরিমণ্ডলে স্বীকার করে নেওয়া হলো যে, সমতলের আদিবাসীদের ভূমি সমস্যার প্রকৃতি ও মাত্রা পার্বত্য অঞ্চলের থেকেও গভীর। সমীক্ষাটিতে মোট ১০টি আদিবাসী দল অন্তর্ভুক্ত করা হয়: ডালু, গারো, হাজং, খাসি, মাহাতো, ওরাঁও, পাত্র, পাহান, রাখাইন, ও সাঁওতাল। সমীক্ষায় ৯৮৪ টি গৃহস্থালি অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যারা ১২টি ভিন্ন জেলায় অবস্থান করে। সাঁওতালদের ২২০ টি গৃহস্থালির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ৬৫ শতাংশ গৃহস্থালি কোনো না কোনো ভূমি গ্রাসের শিকার হয়েছেন, গড়ে একটি সাঁওতাল গৃহস্থালি ১৯৪ ডেসিমেল জমি হারিয়েছেন। সমীক্ষা আরও স্পষ্ট করেছে যে, তিন প্রজন্ম ধরে জমি হারানোর প্রক্রিয়া চলছে। আদিবাসীদের সমতল অঞ্চলে জমি হারানোর প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হিসেবে উপনিবেশিক আমলের বন বিভাগের কার্যক্রমকে একটি বেঞ্চ মার্ক হিসেবে সামনে নিয়ে এসেছেন গবেষকেরা। আবার আদিবাসীদের জমি দখলের আরও একটা 'পিক' সময় ১৯৭১-৮০ বলেও অভিমত দিয়েছেন। অবশ্য আরও অনেক গবেষকের মতো এ গবেষকেরাও মনে করেন এর সূত্রপাত ১৯৪৭-পরবর্তী দেশবিভাগ, যখন অনেক জমি দখল হয়েছে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় এবং তৎকালীন রাষ্ট্রের 'শত্রু' সম্পত্তি ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে। গবেষকেরা আরও মনে করেন, পরবর্তী সময়ে 'ভেস্টেড' প্রপার্টির নামেও হাজং, সাঁওতাল এবং জনগোষ্ঠীর তেভাগা আন্দোলনে অংশ নেওয়ার ওজরে 'কমিউনিস্টদের জমি' দখলের প্রতিযোগিতাও দেখা যায়। এ গবেষণায় কিছু কারণকে চিহ্নিত করা হয়েছে, যা সাধারণভাবে আদিবাসীদের ভূমিসংক্রান্ত দুর্দশার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এগুলো হলো: রাজনৈতিক ও স্থানীয় শ্রেণীভিত্তিক আধিপত্য, দুর্বৃত্তায়িত রাজনৈতিক অর্থনীতি, রাজনৈতিক ক্ষমতার ছত্রছায়ায় বাঙালিদের জমি দখল, রাষ্ট্রের দিক থেকে আদিবাসীদের জমি ব্যবহারে 'ঐতিহ্যবাহী' ধারণাটিকে বুঝতে না পারা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও এর সূত্র ধরে জমি দখল, বিপদগ্রস্ত আদিবাসীর অসহায়ভাবে জমি বিক্রি করতে বাধ্য হওয়া এবং দেশত্যাগ, অশিক্ষা, জমিসংক্রান্ত আইন বুঝতে না পারা এবং 'রিজার্ভ ফরেস্ট' ও 'ইকো পার্কের' নামে সরকারের নানা কিসিমের জমি অধিগ্রহণ। গবেষকেরা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মোট জমি হারানোর পরিমাণ এবং এর বর্তমান বাজারমূল্যেরও একটা ধারণা দিয়েছেন এই গ্রন্থে।

এছাড়া জাতীয় আদিবাসী পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত একটি জরিপের প্রাথমিক ফলাফল থেকে দেখা যায়, মোট ১০ জেলার—দিনাজপুর, নওগাঁ, বগুড়া, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, পঞ্চগড়, রংপুর জয়পুরহাট, ঠাকুরগাঁর—২৪৩৫টি আদিবাসী পরিবার ভূমি হারিয়েছে এবং ভূমি দখল বা হারানোর এ প্রক্রিয়ায় আদিবাসী সম্প্রদায় মোট ৩৮২৭.২৮ একর জমি হারিয়েছে। বিভিন্ন কৌশলে আদিবাসীদের জমি বেদখল হচ্ছে। জরিপ অনুযায়ী সবচেয়ে বেশিসংখ্যক পরিবারের (৭৯৮) জমি বেদখল হয়েছে জমি জবরদখল করার মাধ্যমে (কমন

সম্পদ, শ্মশান, কবরস্থান, পূজামণ্ডপ, ধর্মীয় স্থান)। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ-সংখ্যক পরিবারের (৫৪৯) জমি বেদখল হয়েছে দলিল জাল করার মাধ্যমে। জমির দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যাচ্ছে সর্বোচ্চ পরিমাণ জমি ১১৯৯.৩ একর জমি দখল হয়েছে জমির দলিল জাল করার মাধ্যমে যার ফলে ৫৪৯টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অন্যদিকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পরিমাণ জমি ১১৮৫.৭৬ একর দখল হয়েছে বন বিভাগ কর্তৃক যার ফলে ৫২১টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।[৮]

ছক-১ : ভূমি হারানোর প্রক্রিয়া

ভূমি দখলের কৌশল	পরিবারের সংখ্যা	জমির পরিমাণ (একর)	জরিপকৃত জেলা	যে সকল আদিবাসী সম্প্রদায় ভূমি হারিয়েছে
জাল দলিল	৫৪৯	১১৯৯.৩	দিনাজপুর নওগাঁ বগুড়া রাজশাহী চাঁপাইনবাবগঞ্জ নাটোর পঞ্চগড় রংপুর জয়পুরহাট ঠাকুরগাঁ	পাহাড়ি, মুণ্ডা, সাঁওতাল, ওরাঁও, পাহান
শত্রু সম্পত্তি	১৬২	২৮১.১৯		
বন বিভাগ কর্তৃক দখল	৫২১	১১৮৫.৭৬		
জবরদখল (পৈতৃক সম্পত্তি)	২৫৯	৬৮৭.৯১		
জবর দখল (কমন সম্পদ, শ্মশান, কবরস্থান, পূজামণ্ডপ, ধর্মীয় স্থান)	৭৯৮	২৯৭.১২		
জমি জরিপভুক্ত না করা	৮৪	১৫৩.৫		
সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক	৫৮	১৭.৪৯		
বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক	৪	৫		
মোট	২৪৩৫	৩৮২৭.২৮		

ছক-১ : আদিবাসী জমি দখলের একটি সার্বিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

৪

আলোচনার এই অংশে জাতীয় আদিবাসী পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত পাঁচটি সভার উপস্থাপিত বিষয়াবলির ভিত্তিতে কিছু সাধারণ পর্যবেক্ষণ এখানে তুলে ধরব মাত্র। তবে তার আগে এই সভাগুলোতে উপস্থিত হয়ে কথা বলেছেন এমন কিছু মানুষের নির্বাচিত অংশ এখানে উল্লেখ করছি। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও দূর-দুরান্ত থেকে এবং কখনো কখনো প্রতিকূল আবহাওয়া থাকা সত্ত্বেও প্রতিটি সভায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নানা বয়সের নারী-পুরুষ উপস্থিত হয়েছেন,

তাঁদের কষ্ট ও দুর্দশার কথা বলতে এসেছেন। উল্লেখ্য যে, উপস্থিত জনতার অনেকেই শেষ পর্যন্ত কথা বলার সুযোগ পাননি এবং সেটা কখনো কখনো নানা ধরনের আনুষ্ঠানিকতার কারণে। তবে এ সভায় উপস্থিত থেকে ও অংশ নিয়ে আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, অনেক আশা নিয়ে অনেক মানুষ এ সভাগুলোতে উপস্থিত হয়েছেন। এ উপস্থিতি এ অঞ্চলে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভূমি-সমস্যার গভীরতাকেই নির্দেশ করে। আমরা এখানে কেবলমাত্র নওগাঁ ও জয়পুরহাট অঞ্চলের কিছু নির্বাচিত অংশ এখানে উল্লেখ করছি।

নওগাঁ অঞ্চলের বয়ান

বুদো হাসদা : (পত্নীতলা)...[অন্যের সাহায্যে বক্তব্য বাংলা করা হয়] : আচ্ছা আচ্ছা...বুদো হাসদা...এখন সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে শ্বশুরবাড়িতে থাকে। গ্রামের নাম সাংবাটি পত্নীতলা থানা , তিন ভাই ছিলেন। এক ভাই ইন্ডিয়ায় চলে গেছে অনেক আগে। তার বক্তব্য অনুযায়ী এখন ও যখন চলে গেছে, তার ভাই তার অংশটা বিক্রি করে দিয়ে গেছে। এখন কেউ জানে না...সত্য-মিথ্যা...মানে অ-আদিবাসীদের, মানে বাঙালিদের কাছে বিক্রি করে দিয়ে গেছে...এখন বাঙালিরা তার অংশটুকুসহ অর্থাৎ ১১ একর জমি দখল করে নিয়েছে। তিনি তার অংশ বিক্রি করেননি...

...

অনিল মাহাতো : (ভগবানপুর) আমাদের ভগবানপুর গ্রামে বারোয়াড়ি কালী মন্দিরের নামে দুই একর জমি আছে। এখন সে জমিটি ১৯৭৪ সালে মুসলমানের নামে রেকর্ড হয়ে গেছে...এখন রেকর্ড হওয়ার পরও আমরা কিন্তু দখল পাই নাই। কালী মন্দিরে পূজা চলতেই আছে, তবে ওই রেকর্ডটা এখনো সংশোধন করতে পারতেছি না এবং আমাদের হাতে কোনো কাগজপত্র আসে নাই, তবু তারা আমাদের এখনো হুমকি দিচ্ছে...ওই জমিতে যেন আমরা না নামতে পারি...

উ : জমিটি কি কালী মন্দিরের নামে ছিল?

অ : হ্যাঁ, কালী মন্দিরের নামে ছিল...

উ : জমির পরিমাণ কত?

অ : দুই একর

উ : ওটা কি ৬২-এর রেকর্ড ও আরএস অন্তর্ভুক্ত আছে?

অ : হ্যাঁ, আছে।

সুভাষিণী রানী : [প্রথম দিকে অস্পষ্ট...সম্ভবত তিনি নিজ ভাষায় বলছিলেন...আমার একটা কথা আছে, একজন বলবে আদিবাসী পরিষদের একজন থাকবে। উনি কী বলবেন সেটা আমাদের বলবেন]...আমাদের ১৫ বিঘা জমি, তবে জমির পৈতৃক সম্পত্তি বিশাল... ৭২, ৬২... সব আমাদের নামে রেকর্ড। ১৫ বিঘা জমি মানে জাল করেছিল... ১৫ বিঘার মধ্যে ১০ বিঘা জাল আছে আর পাঁচ বিঘা জবর-দখলে থাকছে...কিছুতেই কেউ আমাকে দখল দিচ্ছে না। সে জাল দলিল নিয়ে মামলা করি। মামলায় আমি ডিক্রি পাইছি, তবুও আমাকে দখল দিচ্ছে না...মানে জমিটা বেদখল হয়ে আছে...সে জমিটি আমি কীভাবে দখল নেব, সে পরামর্শ জানতে আসছি

উ : যে করেছে তার নাম? দখলকারীর নাম?

সু :...নাম? নুরজ্জামান, কাজীর মাস্টার...সাত্তার মাস্টারের বাবা আতর আলী...তার তিন ছেলে আর নুরজ্জামানেরা চার ভাই আর কাজীর মাস্টারেরা তিন ভাই...আর আলিমের তিন বাপবেটা–এ কয়েকজন লোক...
উ : আপনার নামটা অরেকবার বলেন।
সু : আমার নাম শ্রীমতি সুভাষিণী রাণী। আমার স্বামীর নাম শ্রী যোগেশ চন্দ্র মণ্ডল।

পঞ্চানন বর্মণ : বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও সাংবাদিক ভাইদের কাছে আমি আমার দুঃখগুলো খুলে বলবো। আপনারা ধৈর্যসহকারে শুনেন–এ সহায়সম্পত্তি নিয়েই আমাদের দাদার সম্পত্তি ১৯২০ সালের খতিয়ানে উল্লেখ করা আছে, এর আগের কিছু ঘটনা আমি বলি...ঘটনাটা হলো ১৩১৪-১৫ সনে এক লোক–নাম ছিল ত্রৈলোক্যনাথ সাধু...তার কাছ থেকে দুই মণ ধান অথবা ১০০ টাকা হাওলাত করে নিয়ে পরে টাকাটা যদি ফেরত দিতে যেতেন, তিনি নিতেন না...এভাবে যখন ১৯২০ সালের রেকর্ড এল...'২০ সালের রেকর্ডে তিনি আবার ওই যে মহাজন হিসেবে দাবি করে বসলেন যে তারা আমার কাছে ঋণী আছে...রেকর্ডে লিখছেন, ১৭ সাল থেকে ২৪ [বাংলা] সন পর্যন্ত এটা খাইখালাসি সূত্রে পরিশোধ...এর পরে ২৪ সাল যাওয়ার পরেও আমাদের এ সম্পত্তি ফিরিয়ে দেননি...এভাবে আমার দাদারা,...গরিব নিগৃহীত হয়ে সংসারে দুর্বল হয়ে পড়ে...এ সমস্যা সমাধান কী করতে পারি... বড়লোকের সঙ্গে কি আর যুদ্ধ-বিগ্রহ করতে পারি...

বাইজুন সরেন : [হড় ভাষায় কথা বলেন]...আরেকজন বললেন, 'উনার জমি ৩৯ বিঘা। ৩৯ বিঘা জমির সম্পূর্ণই জবরদখল করে নিয়েছে...নিয়ে থাকা সত্ত্বেও তারা ১০ বছর ধরে মামলা চালাচ্ছে। মামলাতে কোনো ফল এখনো পাননি...
উ : মামলা চলছে?
বা : হ্যাঁ...মামলা এখনো চলছে।
উ : কবলা দখল আছে?
বা: না কবলা দখল নাই।

নিমাই বর্মণ : ...সবাইকে আমার নমস্কার, আমি জামালপুর থেকে আসছি, গ্রাম-জামালপুর, থানা-আক্কেলপুর, জয়পুরহাট। আমার নাম হচ্ছে নিমাই বর্মণ। আমার বাবা অনেক ছোট ছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীনেরও পূর্বে...স্বাধীনের আগে আমাদের গ্রাম খুব ছোট ছিল, আর আমার বাবার ভাই ছিল না। তারপর দেশ স্বাধীনের সময় তখন আমার বাবার সম্পত্তিগুলো সব নাকি বিক্রি করে...দখল হয়ে গেছে...জোরপূর্বক এসে কীভাবে জমি মালিক হয়, যেহেতু...আমার বাবা তো এই জমির মালিক, আর আমার বাবা...[অস্পষ্ট]...আমরা নাবালক ছিলাম...বাবা জমি রেজিস্ট্রি করে দেননি...এ জমি এরা জাল দলিল করেছে...এখন জাল দলিল হওয়ার পর জমিটা রেকর্ড হয়েছে, কিন্তু কীভাবে উদ্ধার করা যাবে...জমিটা আমি পাব কি না, সে বিষয়ে আমি জানতে চাচ্ছি।
উ : জমির পরিমাণ কতটুকু?
ব : জমির পরিমাণ হচ্ছে ৬ একর ৭৬ শতাংশ

উ : পুরোটাই বেদখল?
ব : হ্যাঁ, পুরোটাই দখল হয়ে আছে...

নারায়ণ সিং : ভগবানপুর (ধামুইরহাট)...অদ্য কর্মশালায় আদিবাসীদের ভূমিসংক্রান্ত সমস্যার স্বরূপ উন্মোচন ও সুপারিশবিষয়ক কর্মশালায় আমরা একটু আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছি...আমি...আমার বাবা গরিব...আমি ছোট থাকতে আমাদের জমি এক মুসলমান নিয়েছে...[অস্পষ্ট]...একটা সালিস বসে...তারপর আমরা দিশেহারা হয়ে পড়ি...[অস্পষ্ট]...তারপর সে হঠাৎ একদিন রাতারাতি আমার জমির ওপর ঘর বাঁধে...ঘর বাঁধার পর তখন আমি থানায় গেলাম, থানায় গিয়ে কোনো ফল হয়নি। দারোগা সাহেব কখন আসলুম কখন গেলুম বলা গেল না...সে ওই ঘরে বাস করতে লাগল...তখন কয়েক মাস পর ওই লোক আমাকে ধাওয়া করতে লাগল...আমরা ভয় পেয়ে তার সঙ্গে একটা আপস করলাম...তারপর কেসটা তুলে নিলাম...এরপর ওই জমিতে আর যেতে পারি না...
উ : জমির পরিমাণ?
না : আটান্ন শতক।

বিমল টুডু : (ধামুইরহাট)...আমার বাবারা তিন ভাই.. তিন ভাইয়ের মধ্যে আমার বড় বাবা দেশ স্বাধীনের আগে জমিটা বন্ধক রাখলেন..বন্ধক রাখার পর [যুদ্ধের সময়] ভারতে চলে যান.. ফিরে এসে জমি ফেরত নিতে গেলে দখল হয়ে যায়.. এ অবস্থায় মামলা হয়েছে। ১৪ বছর ধরে চলতেছে। এটার কোনো সুরাহা হয়নি। ওই জমিটি মামলা চলাকালীন আমাদের কেস খারিজ হয়ে গেছে।
উ : জমির পরিমাণ?
বি : চার বিঘা।

জয়পুরহাট অঞ্চলের বয়ান

রত্না মুরমু (পাঁচবিবি) : আমার বাবার...আমরা সাত ভাই-বোন। [অস্পষ্ট]
উ : জমি কত?
র : ৬০-৭০ বিঘা জমি।
উ : আপনাদের দখলে কতটুকু জমি আছে?
র : দখলে নাই বললেই চলে।
উ : বিক্রি করেছেন কত?
র : বিক্রি করিনি..
উ : বন্ধক দিয়েছেন?
র : বন্ধক দেওয়া হয়নি।
উ : আপনারা মামলা করেছেন এ জন্য?
র : আমরা...[অর্থনৈতিক কারণে মামলা করেনি]

বীরেন্দ্রনাথ কুজুর : আমার দাদারা ছিলেন ছয় ভাই.. তখন অনেকে ইন্ডিয়ায় চলে গেছে.. আমার বাবারা ছিলেন দুই ভাই.. তারা মারা গেছেন.. ২০০৪ সালে একটা রেকর্ড আসে.. তো অনেক জমিজমা ছিল...আমার বাড়ি হলো পাবর্তী থানা, জয়পুয়হাটের শেষপ্রান্তে.. আগে ছিল জয়পুর থানা, দিনাজপুরের মধ্যে.. বর্তমানে আমার বাবা যেখানে আছেন, সেখানে আমার জন্ম.. আমার বাবা মারা গেছেন.. তো আমাদের ওখানে...[অস্পষ্ট] দলিলপত্র কাগজপত্র সবই আছে...বুঝলেন...কাগজপত্র রেকর্ডের সময় দিনাজপুরে আমাকে দৌড় পারা লাগছে। আমাকে তা উদ্ধার করতে দিনাজপুরে যেতে হবে বুঝলেন...আমি সেদিন গেছিলাম থানা অফিসে মামলা করতে.. তখন অফিসের অফিসার বলেন, আপনার কাগজপত্রের সঙ্গে টাকা চাই। আমি বললাম, কেন ভাই? আমরা কি বাংলাদেশের নাগরিক না? এটা আমার দাদার.. অনেক সম্পত্তি..

উ : কারা দখল করেছে?

কু : বাঙালিরা সমস্ত জমি...

উ : মামলা করেছেন?

কু : না, করিনি..

উ : এখন তো জরিপ চলছে, ত্রিশ ধারায়

কু : হ্যাঁ, জরিপ হচ্ছে..

উ : কতটুকু জমি বললেন?

কু : হবে তো প্রায় ১০০ বিঘা

...

ঝড়ু মাঝি: [উপস্থাপক ঝড়ুর সঙ্গে নিজ ভাষায় কথা বলেন। পরে উপস্থাপক বাংলায় বক্তব্য উপস্থাপন করেন।]

উ : তার জমি সামান্য বন্ধক রেখেছিল। পরে সব জমি ভূমিগ্রাসীরা দখল করে নেয়। বাড়িটুকু নেয়নি। তাও যেকোনো সময় নিয়ে নিতে পারে। মামলাও করেছে...তবে অর্থনৈতিক কারণে মামলা পরিচালনা করতে পারেনি।

...

শিমুল হাজদা : বাংলায় বলব, নাকি আমাদের ভাষায়...

উ : আপনার যেটা ভালো লাগে।

শি : [নিজ ভাষায় বলেন, পরে তা উপস্থাপক বাংলা করেছেন]

উ : শিমুল হাজদা বলেছেন যে তাদের ৪৯ বিঘা জমি, দুইটা শরিক, এক শরিক বিক্রি করেছে সামান্য জমি, কিন্তু তাদের সব জমি জেলা প্রশাসকের বিনা অনুমতিতে কবলা খরিদ করে নিয়েছে। মামলা করেছে, কিন্তু অর্থনৈতিক কারণে তা চালাতে পারেনি। এই হচ্ছে তাদের সমস্যা। একজন শরিক বিক্রি করেছে ১০ বিঘা। বন্ধক ছিল। মামলা এখন চলছে না। অর্থনৈতিক কারণে চালাতে পারেনি, কিন্তু শিমুল হাজদার সব জমিসহ তারা নিয়ে নিয়েছে। এমনকি তারা যে দলিল দেখাচ্ছে, তারও অনুমতি পায়নি...সাহা বা হিন্দু বলে এ রকম তাদের জমি রেজিস্ট্রি করে নিয়েছে। কারণ, আদিবাসীদের জমি বিক্রি করতে হলে এডিসির অনুমতি লাগবে। মামলা চালাতে হলে টাকা লাগবে, তাও পারেনি।

গোপাল হেমব্রম : আমার পিতার ৪৯ শতক বিক্রি হয়েছে, কিন্তু জমি একটু...আছে প্রায় ৫৩ শতকের মতো.. ওটা আমরা নিতে চাচ্ছি। বলছে, আমরা তা দেব না.. জমি ওই রকমই আছে, মাপজোক করিনি।

উ : সমস্যাটা হচ্ছে, তার বাবা ৪৯ শতক বিক্রি করেছেন, কিন্তু আরও অনেক জমি তাদের আছে, পুরোটাই তারা নিয়ে নিয়েছে...এটা পারমিশন করে নাই।

গো : না না, যেটা বিক্রি হয়েছে, তা পারমিশন হয়নি।

উ : কারা নিয়েছে?

গো : বাঙালি।

বিশুনাথ রবিদাস (কালাই থানা) : আমার সমস্যা হচ্ছে...জমি যে ৭০ শতক, খাসজমি। এটা আমাকে দখল দিয়ে দিচ্ছে, তারা আমাকে আর দখল দিচ্ছে না।

উ : বোঝা যাচ্ছে না। আবার বলেন।

র : আমি ভূমিহীন তো। ৭০ শতক, খাসজমি, এ জমি সরকার দিয়েছে। কারণ, ওই জমির ওপর তাদের বাড়ি আছে। তাদের নামে সরকার রেজিস্ট্রিও করে দিয়েছে। মানে ৯৯ বছরের লীজ দিয়ে সেই জমি আবার অন্যরা দখল করে নিয়েছে।

উ : তারা কি...

র : ভূমিগ্রাসী, তাদের বিরাট অবস্থা, জমি অনেক...

উ : আপনি এখন কোথায় আছেন।

র : আমরা এখন ওই জমিতে নাই...অন্যখানে আছি, ভাইয়ের সম্পত্তিতে।

অনন্ত (জয়পুরহাট সদর উপজেলার তেলিতুলি) : আমার সমস্যা হচ্ছে, আমার দাদু একটি পুকুর কিনেছিলেন...১ একর ৩ শতক...পুকুরটি কেনার পর থেকে...তারাই নেয়, তাদের দখলে বর্তমানে আছে...সবকিছু তাদের আছে।

উ : এরা কী বলে?

অ : ওরা বলে, টাকা-পয়সা দিয়ে সবকিছু করে নেবে।

উ : এখন যে মাতব্বর রয়েছে, ওরা করে নিয়েছে, আপনারা অভিযোগ করেননি?

অ : করেছি, লাভ হয়নি।

উ : দখলে কার আছে জমি?

অ : ওদের।

উ : এখন আপনাদের দেয়নি, না? জমি কতটুকু?

অ : না দেয়নি, জমি হচ্ছে ১ একর ৩ শতক।

উ : মামলা করেছেন কি?

অ : মামলা করেছি, শেষ হয়েছে?

উ : কী হয়েছে মামলায়?

অ : মানে, আমাদের যে কাগজপত্র, সব...

উ : মামলার রায় কী হয়েছে?

অ : মামলা রায় হয়নি কোনো পক্ষেই। সরকার খাসজমি দেখাচ্ছে কাগজপত্র রেকর্ডপত্র সব থাকা সত্ত্বেও।
উ : আপিল করেছেন আপনারা?
অ : না।
উ : কেন করতে পারেননি, টাকার অভাবে?
অ : হ্যাঁ, টাকার অভাবে।
উ : জমিটা কে দখল করেছে এখন?
অ : জমিটা...সম্পত্তি হয়েছে ওই সম্পত্তির...আবু তাহের মণ্ডল।

জহর লাল পাহান : আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি সর্বমোট জমি ১২ একর, ১১ শতাংশ। এ সম্পত্তির আগে একবার...সেই সম্পত্তি '৭১-এর পরে এখন দখল হয়ে গেছে, অথচ কোনো কাগজপত্র তার নামে নাই।
উ : জমি কতটুকু?
জ : জমি সর্বমোট ১২ একর ১১ শতক।
উ : ওই জমি আপনার দখলে আছে?
জ : না, দখলে নাই। ওটা আবার কাঠা হিসাবে বিক্রি করে ভাগবাটোয়ারা করে দেয়।
উ : এটা বলেন যারা দখল করেছে, তারা কী বলে?
জ : তারা বলে, আমরা এটা কিনে নিয়েছি।
উ : কার কাছ থেকে?
জ : মহাদেবের কাছে থেকে...কিন্তু সে তো নাই...উধাও।
উ : কে হয় আপনার সে?
জ : কাকা হতো আমার।
উ : কাকা?
জ ; জবরদখল আরও করাইছে। তাকে পিটিয়ে বের করে দিছি। এ সম্পত্তির তিন ভাগের মধ্যে তার অংশ তিনি বিক্রি করেছেন। কিন্তু সব নিয়ে নিয়েছেন।
উ : মামলা করেছেন?
জ : না, মামলা করতে পারেনি। অথচ উনি বলেন জমি বিক্রি হয়ে গেছে। পারমিশন বের করতে বহু ঝামেলা..কেন বিক্রি করবা কী দরকার...
উ : পারমিশন করে...নেয়নি?
জ : না।
উ : বিক্রির টাকা তাকে দেয়নি? আপনার অংশ কত?
জ : ৭.৫ বিঘা।

৫

আমরা আমাদের সংগৃহীত বয়ানের নির্বাচিত একটি অংশ এখানে তুলে ধরেছি। কোনো শেষ কথা এটি নয়। আত্মপরিচয়ের লড়াইয়ের ক্ষেত্রে এই বয়ান গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে বলে আমরা মনে করি। আমরা লক্ষ করেছি যে ভূমি সমস্যার বয়ান করতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন

সম্প্রদায়ের মানুষ খুব স্পষ্ট ও জোরালোভাবে তাদের জমি হারানোর প্রক্রিয়া বা দখলের প্রক্রিয়ায় কারা অংশ নিয়েছে, কতটুকু জমি তাদের রয়েছে, এমনকি বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত ভূমি জরিপে জমির বিবরণ আছে কি না, সে সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন। অনেক ক্ষেত্রে বয়স্ক ব্যক্তিরা বাংলায় না বলে কখনো কখনো নিজ ভাষায় (হড় ও কখনো সাদরি ভাষায়) সে বিবরণ দিয়েছেন।

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের আদিবাসী জনসমষ্টির জমি হারানোর প্রক্রিয়াগুলো প্রায় একই ধরনের। এ ক্ষেত্রে বৃহৎ ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত হিসেবে কাজ করেছে ১৯৪৭ সালের দেশ-বিভাগ, যখন এ অঞ্চলে ব্যাপক অভিবাসন ঘটে। এ সময় অনেক আদিবাসী সম্প্রদায়ের জমি দখল হয়ে যায়। এ ছাড়া ১৯৫০ সালের নাচোল বিদ্রোহ (পুলিশের অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতে অনেকে ভারতে চলে যান), ১৯৬২ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় আদিবাসী সম্প্রদায় জমি হারায়। স্বাধীনতাযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ভূমি দখলের ঘটনা বেড়ে যায় অনেক বেশি।

অনেকের মতে, এ সময় থেকেই উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের আদিবাসী জনগোষ্ঠী ভূমিসংক্রান্ত বিষয়ে জাল দলিল ও মামলার শিকার হয়েছেন। এ অঞ্চলে অবৈধ উপায়ে অন্যের নামে জমি রেকর্ড করিয়ে নেয়া একটি সাধারণ ঘটনা। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, আদিবাসী একজনের জমি অ-আদিবাসী কারও নামে রেকর্ড হয়ে গেছে বা কখনো কখনো 'শত্রু'/'অর্পিত' সম্পত্তি হিসেবে রেকর্ডভুক্ত হয়েছে। মূলত জাল দলিল ও রেকর্ডভুক্তির মাধ্যমে স্থানীয় জোতদাররা[9] আদিবাসীদের জমি দখলের প্রক্রিয়া শুরু করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় স্থানীয় মাস্তান বাহিনীসহ পুলিশ, প্রশাসনের ব্যবহার, যারা মূলত জোতদার ও ভূমিগ্রাসীদের পক্ষে কাজ করে। মতবিনিময় সভায় কে জমি দখল করে নিয়েছে জানতে চাইলে অনেক ক্ষেত্রেই জবাব এসেছে, স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-মেম্বারদের নাম। কখনো কখনো এলাকার কোনো হাজির নাম[10]। স্টেইট অ্যাকুজিশন অ্যান্ড টেনেন্সি অ্যাক্ট ১৯৫০-এর ৯৭ ধারা অনুযায়ী একজন আদিবাসীর জমি বিক্রি/হস্তান্তরের ক্ষেত্রে কিছু বাধ্যবাধকতা আছে। এ ক্ষেত্রে আইনি ধারায় বলা হয়েছে যে একজন আদিবাসী জমি বিক্রি করতে চাইলে প্রথমত তাকে এসি ল্যান্ডের অনুমতি নিতে হবে[11]। বিভিন্ন অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় এই আইনটির বাস্তবায়ন বহু ক্ষেত্রেই হয় না। এ আইনটির কার্যকারিতা নিয়ে তাই প্রশ্ন উঠেছে।

ভূমি ও ভূমির অধিকার প্রশ্নে আলোচনা এখন অনেক সুনির্দিষ্ট হয়ে উঠেছে। কতগুলো বিষয় স্পষ্ট: এখন এটা নিশ্চিত করেই বলা যায় বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অনেক এলাকায়ই আদিবাসীদের জমি বিনা অনুমতিতে বিক্রি হয়েছে। স্টেইট একুজেশন অ্যান্ড টেনেন্সি এক্ট-এর ৯৭ ধারা অনুযায়ী এটি বিধিবহির্ভূত। এ ক্ষেত্রে অনেক আইন বিশেষজ্ঞের অভিমত, সরকার চাইলে একটি অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে এসব জমি হস্তান্তর বাতিল করতে পারে। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে অভিমতটি এই যে ৯৭ ধারার সঠিক প্রয়োগ আদিবাসীদের ভূমির অধিকার সুরক্ষার ক্ষেত্রে কাজে আসতে পারে। এ ছাড়া রংপুর ও দিনাজপুর জেলার অনেক জায়গায় বন বিভাগ 'সামাজিক বনায়ন'-এর নামে জমি দখল করেছে অথচ অনেক ক্ষেত্রেই আদিবাসী

সমাজের বিভিন্ন মানুষের নামে এ জমিগুলোর রেকর্ড আছে। আবার অনেক জায়গায় আদিবাসীরা খাসজমিতে বসবাস করে আসছে, সেগুলো আদিবাসীদের মধ্যে বিতরণ করলে উপকার পাওয়া যাবে। অথচ দেখা যাচ্ছে এ ক্ষেত্রে আদিবাসীরা অগ্রাধিকার পাচ্ছে না, এমনকি খাসজমি বিতরণ থেকে বিরোধ তৈরি হচ্ছে।

এ রকম নানাবিধ মত এখন স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। উদ্যোগ ও সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবগুলোর বাস্তবায়ন এখন জরুরি। আমরা লক্ষ করছি যে নানা পর্যায়ে কথা উঠলেও এ আলোচনা একটি পর্যায়ে এসে থেমে যাচ্ছে। বিশেষত নীতিমালা পর্যায়ে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের আদিবাসীদের ভূমি সমস্যার দিকটি এখনো উপেক্ষিত। উপেক্ষিত প্রান্তিক এই সম্প্রদায়ের পক্ষে উচ্চারিত ল্যান্ড কমিশনের দীর্ঘদিনের দাবীটিও।

আমাদের আশা, এই প্রকাশনা বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের প্রান্তিক আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের জমি হারানোর প্রক্রিয়াগুলো সম্পর্কে আরও সুনির্দিষ্ট ধারণা লাভ করতে সাহায্য করবে, এবং ভূমিবিষয়ক নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের আলোচনাকে বেগবান করবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ইনসিডিন, বাংলাদেশ ছিল এ কাজে আমাদের অলিখিত ওয়ার্ক স্টেশন। নানা সাহায্য পেয়েছি রিতা দাস ও তাজনীন মেরিন লোপার কাছ থেকে। এ কাজে সাহচর্য পেয়েছি রতন সরকার ও নাসিমুল হাসান দীপুর কাছ থেকে। বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দীপু হাসান মুদ্রণ ভ্রম খোঁজার দায়িত্ব নিয়েছেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের দুজন শিক্ষার্থী জ্যোতি সিনহা ও শেখ কাওসার উদ্দিন ট্রান্সক্রিপশন-এর কাজে অংশ নিয়েছেন। আমরা এ সুযোগে সবার কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

টীকা

১। পাঠক লক্ষ করবেন, 'ভুক্তভোগী' শব্দটি জাতীয় আদিবাসী পরিষদ আয়োজিত সভাগুলো চলাকালে বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। আবার এ প্রকাশনার সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত এবং মূল সংগঠকেরা কাজের নানা পর্যায়ে 'এভিডেন্স' ভিত্তিক কাজ হাজির করার কথা গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন। এগুলো নিশ্চয়ই কাকতালীয় বিষয় নয়! এসবই আমাদের বিবেচনায় অধিকার ভিত্তিক আন্দোলনের বৃহত্তর ধারাকেই নির্দেশ করছে (দেখুন হাল ১৯৯৭)। আর সে কারণেই সভাগুলোতে উপস্থিত জনতার বয়ানকে আমরা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছি।

২। এ বিষয়ে দেখুনঃ দেওয়ান ও চৌধুরী (২০০৩)। আলোচ্য লেখাটিতে লেখকদ্বয় পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিচুক্তি-পরবর্তী সময়ে মিলিটারি তত্ত্বাবধায়নে বাঙালি সিভিল বুদ্ধিজীবী সমাজের সেই অঞ্চল পরিদর্শনের প্রসঙ্গ টেনে বলেন : 'সামরিক বাহিনীর নিরঙ্কুশ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এ অভিযাত্রার শান্তি পর্যবেক্ষকদের কাছে কী আশা করেছে এ রাষ্ট্র কিংবা সামরিক প্রশাসকদের তা অনুমান করা সম্ভব হয় অভিযাত্রী দলের পরবর্তী কার্যক্রম দেখে। তাঁরা ফিরে এসে অনেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামের চলমান প্রক্রিয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। সেটা নিয়ে আমাদের আক্ষেপের কারণ নেই। কিন্তু

আমাদের মনে পড়ে, যদি না স্মৃতিবিভ্রম ঘটে থাকে, অধিকাংশ পর্যবেক্ষকেরই *মনোজগৎ জুড়ে বিচরণ করছিল পাহাড়ের 'প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, আর তাদের লেখায়* তা নিরন্তর প্রকাশ পাচ্ছিল। কেউ কেউ সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তে আহ্লাদ প্রকাশ করেছেন, আগ বাড়িয়ে দেখেও ফেলেছেন কোথাও কোনো সৈন্য নেই-'*পাহাড়ি মানুষজন প্রকৃতির কোলে* স্বাভাবিক জীবনযাপন করছেন' বা এই গোছের কিছু' (২০০৩ : ১৩১-১৩২)। বলাবাহুল্য, সুধীসমাজের লেখাটি গ্রহণ না করারই কথা!

৩। এ ক্ষেত্রে সংকটটা ছিল প্রেক্ষিতকরনের দিক থেকে, ইংরেজীতে যাকে বলা হয় কন্টেকসচুয়ালাইজেশন। এই প্রেক্ষিতকরনের কাজে শাস্ত্র হিসাবে নৃবিজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। নৃবিজ্ঞান ও মানবাধিকার বিষয়ে মেসারের একটি আলোচনায় দেখতে পাই, সর্বজনীন মানবাধিকারবিষয়ক আলোচনায় অনেক ক্ষেত্রে আইনি ডিসকোর্স প্রথম থেকে প্রাধান্য পেলেও নৃবিজ্ঞানের ভূমিকা কম নয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সেটা স্বীকৃতি পায় না। মেসারের এ আলোচনায় মানবাধিকারের ডিসকোর্সের প্রেক্ষিতকরণের প্রসঙ্গ বারবার এসেছে। দেখুন মেসার (১৯৯৩)।

৪। অন্যত্র পান্ডে সাম্প্রদায়িকতা (কমিউনালিজম) প্রসঙ্গে বলছেন, এটি উপনিবেশিক জ্ঞানের একটি ধরন (১৯৯০: ৬)। সাম্প্রদায়িকতা প্রত্যয়টি, তাঁর মতে, সে সব কিছুকেই নির্দেশ করে, যা অপ্রক ও আদিম, অর্থাৎ ঐসব কিছু যা উপনিবেশ তার নিজ হিসাবে মনে করেনা। সাম্প্রদায়িকতা প্রসঙ্গে লিখতে যেয়ে বা ধরুন শব্দটা ব্যবহার করতে যেয়ে পান্ডে শব্দটা কেটে দেননি তবে এক্ষেত্রে তিনি একটি সাফাই দিয়েছেন: "যোগাযোগের সুবিধা, এবং একটি সুবিধাজনক সংক্ষিপ্ত রূপ এই পদ ব্যবহার করতে বাধ্য করে। শব্দটি ভারতের রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক শব্দমালায় ঢুকে গেছে: এবং যদিও এই পদটির ব্যহারকে আমাদের প্রশ্ন করতে পারা দরকার, এবং আমার মতে উচিত, তথাপি অন্য কোনো উপায়ে 'সাম্প্রদায়িকতা' শব্দটি দিয়ে যে অভিজ্ঞতা ও ধারণাকে বর্ণনা করতে চেষ্টা করা হয় তা নিয়ে কথা বলা সহজ নয়" (পান্ডে ১৯৯০)।

৫। গবেষকদের এই বিশ্লেষণ সাঁওতাল জনগোষ্ঠীকে একটি সংহত (কোহেরেন্ট) গ্রুপ হিসেবে দেখবার উপনিবেশিক তাগিদ থেকে উদ্ভূত কি? এ বিষয়ে একটি আলোচনার সূত্রপাতের জন্য দেখুনঃ সুমন (২০০৩)।

৬। এ বিষয়ে ধারণা পেতে দেখুন শ্বেন্দেল (১৯৯২) ও ত্রিপুরা (১৯৯৬)। এ বিষয়ে পাভেল পার্থ এক প্রবন্ধে 'আদিবাসী' সমাজ নিয়ে সুশীল সমাজে বিদ্যমান তৎপরতার বিরুদ্ধাচরণ করলেন এবং উদাহরণসহ দেখিয়ে দিলেন বাঙালি সমাজে 'আদিবাসী'-বিষয়ক তৎপরতার স্বরূপ, যার নাম তিনি দিয়েছেন 'বাঙালি ব্যাটাগিরির ক্যামেরা।' দেখুন পার্থ (২০০৪)।

৭। এ গ্রন্থটি এই প্রকাশনার একেবারে শেষ সময় আমাদের হাতে আসাতে বর্তমান আলোচনায় আমরা অদিতি ফাল্গুনীর একটি গ্রন্থ পর্যালোচনার সাহায্য নিয়েছি। দেখুনঃ ফাল্গুনী (২০০৯)।

৮। এখানে বলে রাখা দরকার, জরিপ করতে গিয়ে সীমিত লোকবলের সাহায্যে যতটুকু তথ্য আমরা পেয়েছি, তাই উপস্থাপন করছি এখানে। এ জরিপ জাতীয় আদিবাসী পরিষদের নিজ উদ্যোগে করা, খানিকটা কাজের সূত্রে। বিভিন্ন এলাকা থেকে যতটা সম্ভব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের ভাষায় আগে থেকেই 'স্যাম্পলিং ইউনিভার্স' ঠিক করে 'স্যাম্পল পুল' করা হয়নি; বরং স্বাভাবিকভাবেই যতটা তথ্য এসেছে তার সবই একত্র করা হয়েছে। সে অর্থে এটাকে এলাকাভিত্তিক পারপোসিভ স্যাম্পল বলা যায়। আমরা নিশ্চিত, আরও ব্যাপক অনুসন্ধান চালালে এ চিত্র ভিন্ন হতো।

৯। আদিবাসী ভুক্তভোগী অনেকেই তাঁদের সমস্যার বয়ান করতে গিয়ে এ জোতদার জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করতে শুধু মুসলমান শব্দটি ব্যবহার করেছেন বা কখনো কখনো ব্যক্তির পরিচিতিমূলক টাইটেল ব্যবহার করেছেন। আয়োজকদের দিক থেকে কখনো কখনো 'মুসলমান না বলে ভূমিগ্রাসী বলেন' এ রকম পরামর্শ দিতে দেখেছি।

১০। স্কটের উল্লেখযোগ্য গবেষণা 'উইপেনস্ অব দি উইক' (১৯৮৫) এ 'হাজি ব্রুম' তেমনি এক চরিত্র।

১১। স্টেইট অ্যাকুজিশন অ্যান্ড টেনেন্সি অ্যাক্ট ১৯৫০-এর ৯৭ ধারার উপধারা ৩ অনুযায়ী 'If in any case an aboriginal *raiyat* desires to transfer holding or any portion thereof by private sale, gift or will to any person who is not such an aboriginal, he may apply to the Revenue Officer for permission in that behalf, and the Revenue Officer may pass such order on the application as he thinks fit having regard to the provisions of section 88 and 90" উপ-ধারা ৪ অনুযায়ী "Every transfer referred to in sub-section (3) shall be made by registered deed; and before the deed is registered and the holding or any portion thereof is transferred, the written consent of the Revenue Officer shall be obtained to the terms of the deed and to the transfer." এ ধারাগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন : হাসান ও সরেন (১৯৯০)

গ্রন্থপঞ্জি

ইলিরা দেওয়ান ও মানস চৌধুরী (২০০৩) শান্তিচুক্তির পর: বাংলাদেশের বিদ্যোৎসাহী মহল এবং রাষ্ট্রের অবিশ্লেষিত ক্ষমতা; *বিপন্ন ভূমিজ : অস্তিত্বের সংকটে আদিবাসীসমাজ বাংলাদেশ ও পূর্বভারতের প্রতিচিত্র*; সম্পাদনা মেসবাহ কামাল ও আরিফাতুল কিবরিয়া; আরডিসি, ঢাকা।

পাভেল পার্থ (২০০৪) বাঙালির ক্যামেরাগিরিতে 'অপর' আলোকচিত্র, *কাউন্টার ফটো*, প্রথম বর্ষ; প্রথম সংখ্যা; দৃক আলোকচিত্র গ্রন্থাগার লিমিটেড এবং কাউন্টার ফটো-এ সেন্টার ফর কমিউনিকেশন।

হিরেন দাস (২০০৭) সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর জীবনের মান উন্নয়নে আত্মসচেতনতা ও আত্মনির্ভরশীলতার পথ অনুসন্ধান; রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ, বাংলাদেশ।

Barkat, A., Mozammel Haque, Sadeka Halim, Asmar Osman. 2009. *Life and Land of Adibashis : Land Dispossession and Alienation of Adibashis in the Plain Districts of Bangladesh.* Dhaka: Pathak Shamabesh.

Bleie, T. 2005. *Tribal Peoples, Nationalism and the Human Rights Challenge: The Adivasis of Bangladesh.* Dhaka: The University Press.

Falguni, A. 2009. A Study of the Land Grabbing in the Plains. *The Star*, 14: 642.

Hale, C.R. 1997. Cultural Politics of Identity in Latin America. *Annual Review of Anthropolog*, 26 (pp. 567-590).

Hasan, R, M Saren. 1990. *Civil Law, Adibasir Sampatti Hastantar O Khaikhalasi bandhakk Ayeen.* Hasan Law House, Rajshahi

Malkki, L.H. 1997. News and Culture: Transitory Phenomena and the Fieldwork Tradition. In A. Gupta and J. Ferguson. eds. *Anthropological Locations: Boundaries and Grounds of a Field Science,* eds. University of California Press, pp. 86-101.

Messer, Ellen. 1993. Anthropology and Human Rights. *Annual Review of Anthropology*, 22: 221-249.

Pandey, Gyanendra. 1990. *The Construction of Communalism in Colonial North India.* Delhi: Oxford University Press

Schendel, W. Van. 1992. The Invention of the 'Jummas': State Formation and Ethnicity in Southeastern Bangladesh. *Modern Asian Studies*, 26(1): 95-128.

Scott, James C. 1985. *Weapons of the Weak. New Haven.* Conn.: Yale University Press.

Sumon, Mahmudul. 2003. Adivasi land law, anthropological and historical discourse: Binding upon the adivasis?. *Nrvijnana Patrika*, 8.

Tripura, Prashanta. 1992. The Colonial Foundation of Pahari Ethnicity. *The Journal of Social Studies*, 58.